মওলানা ভাসানী
রাজনীতি, দর্শন ও ধর্ম

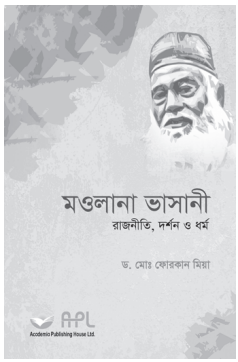

ড. মোঃ ফোরকান মিয়া

প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম
সম্পাদিত

APL
Academia Publishing House Ltd

Academia Publishing House Ltd

মওলানা ভাসানী: রাজনীতি, দর্শন ও ধর্ম

রচনা

ড. মোঃ ফোরকান মিয়া

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম

গ্রন্থস্বত্ব ©

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশক

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য

৪০০.০০ টাকা

প্রকাশকাল

ফাল্গুন ১৪২৮, ফেব্রুয়ারি ২০২২, রজব ১৪৪৩

Contacts

253/254, Concord Emporium Shopping Complex
Kataban, Elephant Road, Dhaka- 1205, Bangladesh
Cell: 0183 296 9 280 ■ 01923 489 165
E-mail: aploutlet01@gmail.com ■ aplbooks2017@gmail.com

ISBN
978-984-35-1678-7

উৎসর্গ

আমার নির্মল আনন্দ ও সুস্থ বিনোদনের উৎস
আমার উত্তরসূরী ***রাফিদ আবদুল্লাহ*** ও ***তাহিরা তাসনিম***

লেখকের কথা

অর্থের লোভ ও ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে মানবতাবাদী রাজনীতির জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে যে গুটিকয়েক রাজনীতিক স্মরণীয় হয়ে আছেন মওলানা ভাসানী তাদের একজন। এজন্যই তাঁর নামের সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিল 'মজলুম জননেতা'। তিনি ছিলেন ডানপন্থী-বামপন্থী, ইসলামপন্থী-সমাজতন্ত্রী সবারই ভরসার জায়গা বা আশ্রয়স্থল। *'মওলানা ভাসানী: রাজনীতি, দর্শন ও ধর্ম'* গ্রন্থটি এতদসংক্রান্ত আমার গবেষণার ফসল। এ গ্রন্থে আমি মওলানা ভাসানীর বিশ্বাস, রাজনৈতিক চর্চা ও ধর্মচিন্তার একটা বিশ্লেষণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি তা বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকের ওপর।

গ্রন্থটি লেখার পর পুরো পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের লক্ষ্যে মূল্যবান পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট কবি জনাব আবদুল হাই শিকদার। এছাড়া গ্রন্থ লেখার কাজে উৎসাহ, নির্দেশনা ও সম্পাদনা এবং বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন আমার শিক্ষাগুরু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম স্যার। তাদের উভয়ের নিকট আমি ঋণী।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম. আবদুল আজিজ এবং আমার বিজ্ঞ সহকর্মী দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাসুদ আলম'র কাছে- প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

গ্রন্থটি প্রকাশের প্রস্তুতিতে আমার স্ত্রী ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব আফরোজা আলো'র উৎসাহ ও প্রেরণা অপরিশোধযোগ্য।

বইটির উপর যেকোনো আলোচনা-সমালোচনা, উপদেশ, পরামর্শ সাদরে গ্রহণের অবারিত প্রতিশ্রুতি থাকলো পাঠক ও সুধীমহলে।

ড. মোঃ ফোরকান মিয়া
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন
সরকারি শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল।

সূচি

প্রাক্‌কথন ix

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাসানী দর্শনের পটভূমি ২১

ভাসানীর জন্ম ও শৈশব ২১

রাজনৈতিক দীক্ষা অতিবাহিত শিক্ষা জীবন ২৪

পারিবারিক জীবন ২৯

রাজনীতির পথ পরিক্রমা ৩২

জীবন অভিজ্ঞাত দ্বন্দ্বমুখর দর্শন ৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক দর্শন : লোকজ, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক উপাদান ৪৯

রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি ৪৯

লোকজ উপাদান ৫০

ক. সংস্কৃতি ৫১

খ. অসাম্প্রদায়িকতা ৫৫

গ. স্পষ্টবাদিতা ৬১

ঘ. কৃষক দরদ ৬৬

ঙ. রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে নৈতিক বাধ্যবাধকতায় রূপান্তর ৭৩

ধর্মীয় উপাদান ৭৬

আন্তর্জাতিক উপাদান ৯১

ভাসানী রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ১০১

ক. রাজনীতি ১০২

খ. গণতন্ত্র ১০৬

গ. স্বাধীনতা ১১১
ঘ. নির্মোহ-নিস্পৃহ রাজনৈতিক জীবন দৃষ্টি ১১৫
রাজনৈতিক দর্শনের স্বরূপ ১২১

চতুর্থ অধ্যায়
মওলানা ভাসানীর সমাজ দর্শন ১২৩
সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধিতা ১২৩
নির্বাচন ১৩২
বিশ্বশান্তি ১৩৬
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার চেতনা ১৪০
ধর্ম ও জাতীয়তার সমন্বয় ১৪৫
বিপ্লব ১৪৭
বৈদেশিক সাহায্য ১৫৪
আমলাতন্ত্র ও ভাসানী ১৫৮
দুর্নীতি সম্পর্কে ভাসানী ১৬০
শিক্ষা দর্শন ১৬৪
উপসংহার : 'বিপ্লবী ধর্মতত্ত্ব' ১৭৩

পঞ্চম অধ্যায়
রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও বাস্তবায়ন কৌশল ১৮১
রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ও বাস্তবায়ন কৌশল ১৮১
জনসাধারণকে অধিকার সচেতন করা তথা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা ১৮২
ক. ধর্মীয় অনুভূতির ব্যবহার ১৮২
খ. বক্তৃতা কৌশল ১৮৫
গ. দৈনন্দিন সমস্যাকেন্দ্রিক রাজনীতি ১৮৯
ঘ. খুৎবার রাজনৈতিক ব্যবহার ১৯০
ঙ. গণযোগাযোগ কৌশল ১৯১
চ. সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ১৯৩
ছ. কৃষক সম্মেলনের কৌশল ১৯৫
কর্মপন্থা নির্ধারণ ১৯৭
আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে দাবি আদায় ২০৪
ক. অনশন ২০৫

খ. ভুখা মিছিল ২১৬
গ. ঘেরাও আন্দোলন ২১৯
ঘ. গ্রামভিত্তিক আন্দোলন ২২৩
ঙ. আন্দোলন সংগ্রামে বহুমাত্রিক ধারা সংযোজন ২২৯
চ. আন্দোলনের চরম পর্যায়ে হিংসাত্মক হওয়া ২৩২
ছ. আন্দোলনের প্রচার কৌশল ২৩৫
জ. লংমার্চ ২৩৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
Prophet of Violence:
সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে বিপ্লবী ধর্মবেত্তা ৩৪৩

ভাসানী রাজনীতির প্রত্যুষকাল ২৪৩
বিপ্লবী ধর্মবেত্তার উত্থান পর্ব ২৪৬
সংঘাতের প্রান্তিক পর্যায় ২৪৮
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ২৫৪
কায়েমি স্বার্থবাদবিরোধী আন্দোলনের সূচনা ২৫৮
গণমানুষের আত্মার আত্মীয় ২৬২
বিপ্লবী রাজনীতির রৌদ্রকরোজ্জ্বল অধ্যায় ২৬৭
রাজনৈতিক দ্বান্দিকতা ২৬৮
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি: প্রগতিশীল রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকতা ২৭৩
'৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান : 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স' ২৭৭
জীবন সংগ্রামের প্রত্যাশিত গন্তব্য ২৮২

সপ্তম অধ্যায়
স্বাধীন বাংলাদেশে ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শন : ইসলাম ও সমাজতন্ত্র ২৯৩

ইসলামি সমাজতন্ত্র ২৯৩
হুকুমতে রব্বানিয়া ও রবুবিয়তের দর্শন ৩১২
হক্কুল এবাদ : বিপ্লবী রাজনীতির উপসংহার ৩২০
খোদা-ই-খিদমতগার : বিপ্লবী রাজনীতির জনশক্তি ৩২৪

অষ্টম অধ্যায়
ভাসানীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রগতিশীলতা, দ্বৈধতা এবং সমন্বয় প্রয়াস ৩৩১
ভাসানী দর্শনের দ্বৈধতা ৩৩১
ক. আদর্শের স্থায়িত্ব প্রসঙ্গে ৩৩২
খ. পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাই পাকিস্তান ভাঙার কারিগর ৩৩৫
গ. নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন ৩৩৭
ঘ. ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের দ্বান্দ্বিকতা ৩৪০
ঙ. ভারতপন্থি ও ভারতবিরোধী ৩৪১
চ. সাম্প্রদায়িকতা বনাম অসাম্প্রদায়িকতা ৩৪৫
ছ. আধ্যাত্মিকতা ও বিপ্লবী দর্শনের সংঘাত ৩৫০
জ. আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী রাজনীতির দ্বৈধতা ৩৫১
ঝ. বামপন্থিদের সাথে সাযুজ্য ও বিরোধ ৩৫২
ঞ. আইয়ুব খান বিতর্ক ৩৬১
ট. ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন বিতর্ক ৩৬৮
ঠ. ১৯৭৩ সালের নির্বাচন রহস্যময়তা ৩৭২
ড. ১৯৭৬ সালের নির্বাচন: নেতিবাচকতার আড়ালে সমর্থন ৩৭৭
সমন্বয় প্রয়াসের সার্বিক মূল্যায়ন ৩৮০
উপসংহার ৩৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ৩৮৭
পরিশিষ্ট ১: যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ৩৯৬
পরিশিষ্ট ২: Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani's Appeal to World Leaders ৩৯৯
পরিশিষ্ট ৩: প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা মওলানা ভাসানীর পত্র ৪০৭

প্রাক্‌কথন

এক.

পৃথিবীর এই অঞ্চলের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে মওলানা ভাসানী এক অবিস্মরণীয় পিতৃপুরুষের নাম। উপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্তি তথা বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় তিনি তাদের একজন। পরবর্তীকালে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ' (হামজা আলাভী: ১৯৭২) বিরোধী স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনিই ছিলেন উৎসমূল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এই অনিবার্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম রাজনৈতিক দল সংগঠিত করেন। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালে তিনি গণবিরোধী শক্তিকে পর্যুদস্ত করেন। তিনিই সেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা যিনি পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম উচ্চারণ করেছিলেন 'আসসালামু আলাইকুম', কথিত 'নিউক্লিয়াস' (মহিউদ্দিন: ২০২১) এর অনেক আগে। তাই সঙ্গতভাবেই তাঁকে বলা যায় বাংলাদেশের সার্থক স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের চেয়ে স্বাধিকার আন্দোলনকে তিনি অগ্রাধিকার দেন। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচন বর্জন করে স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্‌কালে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে জাতীয় নেতৃত্বকে স্বাধীনতার পথে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন। এই জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দিয়েছেন যথার্থ সম্মান। তাই মওলানা ভাসানী আমাদের পিতৃপুরুষদের একজন। বলা যায় পিতামহ। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে কালরাত্রির কালো সময়ের পর অগত্যা তিনি সীমান্ত অতিক্রম করেন। সেখানে ন'মাস ধরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর নাগরিক স্বাধীনতা অর্জনের পথে নিরন্তর সংগ্রাম করেন।

মওলানা উপাধিধারীরা ধর্মীয় নেতা হিসেবেই সমধিক বরেণ্য। সেক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী একটি উজ্জ্বল স্বকীয় সত্তা। তিনি ধর্মীয় নেতা ছিলেন এবং সেই সাথে ছিলেন জননন্দিত রাজনৈতিক নেতা। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার মেহনতি মানুষের মুক্তির দিশারীদের সাথে উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। ধর্মের চেতনা বিশেষত খ্রিস্টধর্মের মূল দর্শনের আলোকে গোটা লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাংশে স্বাধীনতা ধর্মতত্ত্ব (লিবারেশন থিওলজি) এবং বিপ্লবী ধর্মতত্ত্ব (রেভুলেশনারী রিলিজিওন) এর বিকাশ ঘটে। খ্রিস্টধর্মীয়

নেতারা বাইবেলে কথিত স্বাধীন মানবসত্তার আলোকে উপনিবেশিক তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা পালন করেন। মওলানা ভাসানী এই উপমহাদেশে এবং বাংলাদেশে তাঁর স্বধর্ম ইসলামের আলোকে খ্রিস্টধর্মতাত্ত্বিকদের মতোই স্বাধীনতার ও মানবতার পক্ষে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন। অনেক পশ্চিমা সমাজতাত্ত্বিক মওলানা ভাসানীকে স্বাধীনতা ধর্মতত্ত্ব ও বিপ্লবী দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। খ্রিস্টধর্মবেত্তাদের সাথে তুলনীয় হলেও মওলানা ভাসানীর আদর্শ ও আন্দোলন ছিল স্বকীয় ধারায় মহিমান্বিত। তিনি মুক্তি ও মানবতার আবেদনকে খ্রিস্টধর্ম থেকে ধার করেননি। এটি ছিল ইসলামেরই মর্মকথা। তাই দেখা যায়, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষত উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিকরা 'জেহাদ' করেছেন। এক্ষেত্রে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে উমর মুখতার ছিলেন এক বিপ্লবী মুজাহিদ। আলজেরিয়ায় আবদুল কাদের। সুদানে আল মেহেদী। আরব জাহানে আবদুল ওয়াহাব। মধ্য এশিয়া তথা আফগানিস্তানে জামাল উদ্দিন আফগানি। এই উপমহাদেশও সে ধারায় ধন্য। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী সে ধারার বিপ্লবী পুরুষ। এই বাংলাদেশে হাজী শরীয়তউল্লাহ, হাজী নিসার আলী তিতুমীর ও ফকির মজনু শাহ সে ধারারই পথিক। মওলানা ভাসানী ছিলেন একই ধারার সর্বশেষ যোদ্ধা। যিনি একই সাথে স্বাধীনতা ও মানবিকতার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন। কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা করে তিনি জনগণকে আন্দোলনে উজ্জীবিত করতেন। ইসলামকে তিনি সমাজতন্ত্রের প্রতিরূপ বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ নয়, গরিব-দুঃখী মানুষের মুক্তি। মার্কসবাদী তথা বামধারার লোকেরা তাঁকে ভালোবাসতেন। তাঁর মাধ্যমে তাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় মার্কসবাদ থেকে ভিন্ন কিছু। আবার প্রচলিত আলেম ওলামাদের রাজনীতি থেকে স্বতন্ত্র। সে আন্দোলন পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় স্বকীয় সত্ত্বায় দেদীপ্ত।

শুধু ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য নয়, উপমহাদেশে ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনীতির বিপরীতে চিরবিরোধী রাজনীতির উজ্জ্বল উদাহরণ তিনি। একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই তাঁর অগ্রজ প্রতীয়মান হতে পারেন, অন্য কেউ নয়। বাংলাদেশের রাজনীতির পঞ্চাশ বছরে মওলানা ভাসানীর চিরবিরোধী চিরবিদ্রোহী রাজনীতির দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে তিনি বরিত হয়েছেন 'মজলুম জননেতা' হিসেবে। পাকিস্তান আমলে 'বিপ্লবী ধারার রাজনীতিবিদ হিসেবে অভিহিত হয়েছেন রেড মওলানা

হিসেবে'। (নুরুল কবীর: ২০১২) ১৯৬৯ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে বলেছে, প্রফেট অব ভায়োলেন্স বা সন্ত্রাস-সহিংসতার অবতার। (মেসবাহ কামাল: ১৯৯২: ১৪২-৪৩)

মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদী চরিত্র আজন্ম লালিত। জমিদারের অত্যাচার, আসামে বাঙালি খেদাও তথা লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জননেতা হয়েছেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে তিনিই পূর্ব বাংলার প্রথম ব্যক্তি যিনি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়েছেন। প্রাদেশিক পরিষদের সাময়িক সদস্য হিসেবে ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আমরা সেন্ট্রাল গর্ভনমেন্টের গোলাম কি না?' পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে রাজনীতি যখন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে, যখন সবাই কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের এতদ্বেশীয় তাবেদারদের ভয়ে ভীত, তখন তিনিই সেই অকুতোভয় নেতা যিনি পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে জন্মলাভ করে আজকের আওয়ামী লীগের পূর্বসুরী আওয়ামী মুসলিম লীগ। সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। নবগঠিত বিরোধী দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মেধাবী নেতা শামসুল হক (পরবর্তীকালে নিরুদ্দেশ)। যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। খাজা গজাদের নিয়ন্ত্রিত সামন্তবাদী অসাধারণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গঠিত হয় সাধারণের দল আওয়ামী লীগ। পরদিন ২৪ জুন আরমানিটোলা ময়দানে পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিরোধী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। ভাষা আন্দোলনের সূচনার নেতৃত্ব তাঁর। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয় তাঁরই সভাপতিত্বে। এ সময় ষোল মাস কারাবরণ করেন তিনি। ১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠনে শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে সমদায়িত্ব পালন করেন মওলানা ভাসানী। ১৯৫৭ সালের ৫-৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানকে লক্ষ করে ঘোষণা করলেন 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থাৎ বিদায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পর্যায়ে মওলানা ভাসানী একই ধরনের উচ্চারণ করেছেন। সেই সময়ে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক জোটে যোগদানের ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতা করেন। সোহরাওয়ার্দী বলেন, পূর্ব বাংলার ৯৮% স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হয়েছে। মার্কিন জোটের ব্যাপারে মওলানা ভাসানী নির্দেশিত মুসলিম জোটের বিপক্ষে বলেছিলেন 'জিরো প্লাস জিরো ইকুয়াল টু জিরো'। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশ নিয়ে মওলানা

ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপের মস্কো বনাম পিকিং বিভাজন ঘটলে তিনি পিকিংপন্থীদের নেতৃত্ব দান করেন। ১৯৬৪ সালে আইয়ুবের সামরিক শাসনের পর রাজনীতির সূচনা হলে মওলানা ভাসানী অন্যান্য নেতাদের সাথে দলীয় রাজনীতির বদলে গণতন্ত্রের সংগ্রামকে প্রাধান্য দেন। এভাবে গঠিত হয় কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি-'কপ'। ১৯৬৯ সালে মওলানা ভাসানী বায়তুল মোকাররমে প্রথম মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গণআন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্কারী জলোচ্ছ্বাস ঘটে। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। উপদ্রুত এলাকা সফর শেষে ২৩ নভেম্বর পল্টন ময়দানে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে 'লাকুম দ্বীনুকুম *ওয়ালিয়া দ্বীন*' বললেন। তখন কবি শামসুর রহমান লিখলেন:

'বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতিদ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয় মৌলানার সফেদ পাঞ্জাবী
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবী দিয়ে সব
বিধ্বস্ত বে আবরণ লাশ কী ব্যাকুলে ঢেকে দিতে চান।'

১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর আবারও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ঘোষণা দেন। ১৮ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে রংপুরের জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা পুনরায় উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী বঙ্গবন্ধুকে প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেন। মওলানার ভাষণে তখন ন্যাপ নেতারা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা তৈরি করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, যখন বঙ্গবন্ধু 'জয় বাংলা' বলছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন তখন মওলানা ভাসানী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা বলছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ এবং স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে তত্ত্বগত বিভেদ রয়েছে। মওলানা ভাসানী তাঁর ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেরই প্রতিধ্বনি করছিলেন। স্মরণীয় যে, আবুল মনসুর আহমেদ বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে 'ইন্ড অব দ্য বিট্রেয়াল অ্যান্ড রেস্টোরেশন অব লাহোর রেজুলেশন' অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার শেষ এবং লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বলে বর্ণনা করেছেন। মওলানা ভাসানীর স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ধারণায় অবিভক্ত বাংলার অপর অংশের আদর্শিক ও ভাষাগত সংশ্লিষ্টতা ছিল না। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ধারণায় একান্তভাবেই ১৯৪৭ সালে অর্জিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও ধর্মীয় পরিচয় বিধৃত

ছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, পরবর্তীকালে শহীদ জিয়াউর রহমান যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করেন তার সাথে মাওলানা ভাসানী ঘোষিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান-এর আত্মিক, তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক মিল রয়েছে। মওলানা ভাসানীর অনেক অনুসারী স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ভারতের দিল্লী, দেরাদুন ও কলকাতায় অবস্থান করেন। মুক্তিযুদ্ধকে সর্বদলীয়ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টায় তাঁকে সভাপতি করে ন্যাপ মুজাফফর, সিপিবি ইত্যাদি দল সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। এ সময় মওলানা ভাসানী পৃথিবীর বিভিন্ন নেতানেত্রীকে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লেখেন। এদের মধ্যে রয়েছেন চীনের চেয়ারম্যান মাও জে দুঙ, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি ও জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট প্রমুখ। মওলানা ভাসানীর ভারতে থাকাকালীন সময়কে অনেকে 'অন্তরীণ অবস্থা' বলে বর্ণনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও মওলানা ভাসানী দেশে ফিরেন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ২২ জানুয়ারি, ১৯৭২।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি তাঁর সেই চিরায়ত বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পাকিস্তান আমলে বামধারার রাজনীতিকরা তাঁর সাথী হলেও স্বাধীনতার পর তারা স্ব স্ব রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মওলানা ভাসানী একরকম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। একান্ত অনুসারীরা তাঁকে ঘিরে থাকেন। এ সময়ে তিনি আরো গভীরভাবে ইসলামী ধ্যান-ধারণাপুষ্ট রাজনীতির কথা বলেন। তিনি হুকুমতে রব্বানিয়া ও রবুবিয়তের দর্শন প্রচার করেন। ইসলামী সমাজতন্ত্রের পক্ষে জনমত গঠন করেন। তবে মওলানা ভাসানীর রাজনীতি ও ধর্ম-দর্শনে স্বাতন্ত্র্য ছিল। এই গবেষণাকর্মের নির্যাসে বলা হয়েছে: 'মওলানা ভাসানী এদেশের একমাত্র রাজনীতিক যথার্থভাবে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ছিল রাজনীতির অন্যতম উপাদান, যদিও তিনি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করতেন না। এজন্যই তাঁর ধর্ম কখনও রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেনি। আবার তাঁর রাজনীতিও ধর্ম পালনে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। তিনি ধর্মের বিপ্লবী আদর্শকে রাজনীতিতে প্রয়োগ করেছেন সাফল্যের সাথে। তিনি ছিলেন একই সাথে ধর্মতাত্ত্বিক ও বিপ্লবী রাজনীতিক। তিনি ধার্মিক ছিলেন সাম্প্রদায়িক না হয়ে। বিপ্লবী ছিলেন ধর্মকে বিসর্জন না দিয়ে। পীর হয়েও তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে প্রগতিশীল রাজনীতির

নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধকে রাজনীতিতে প্রয়োগের পক্ষপাতি ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্র।'

যেকোনো জাতির মুক্তিসংগ্রাম একটি সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াস। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ জাতির রাষ্ট্র অতিক্রম করেছে অনেক নদীর বাঁক। এইসব বাঁক পরিবর্তনে একেকটি পর্যায়ে একেক ধরনের নেতৃত্ব হয়ে উঠেছে অনিবার্য। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে যারা শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ ও আল্লামা আবুল হাশেম প্রমুখ। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সাধারণ মানুষ ও জাতীয় নেতৃত্ব মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে। এই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় কারো নেতৃত্বই অস্বীকার করার মতো নয়। ডান-বাম, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সকল নেতৃত্ব আমাদেরকে স্বাধীনতার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি তখন অতীত ও বর্তমানের সকল সত্য ও সকল সত্ত্বাকে নিয়ে আমাদের আগুয়ান হতে হবে। সকল মুক্তিকামী জাতির ইতিহাসে একক নেতৃত্বের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সম্মিলিত নেতৃত্বের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজনের বদলে জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির কৃতিত্ব দেওয়া হয় সম্মিলিতভাবে বেশ কয়েকজনকে। তারা বলে, ফাদারস ফিগারস বা পিতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব। আমাদের ইতিহাসে বাংলাদেশ জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকলের শীর্ষে রয়েছেন। বাংলাদেশ জাতির অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর অনন্য অবদানের আগে ও পরে যেসব নেতৃত্ব পাহাড় কেটে কেটে আমাদের জন্য সমতল স্বাধীনতার সোপান নির্মাণ করেছেন তারা সকলেই স্মরণীয় ও বরণীয়। তাই স্বাধীনতার এই ৫০ বছর পূর্তিতে আর সকলের সাথে মওলানা ভাসানীকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। 'যুগ যুগ জিও তুমি, মওলানা ভাসানী'।

দুই.

বক্ষমান গ্রন্থনা মূলত একটি গভীর গবেষণা কর্মের ফলাফল। বিসিএস শিক্ষা এর সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ফোরকান মিয়া আমার তত্ত্বাবধানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগে এটি সম্পাদন করেন। মওলানা ভাসানীকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি ও গবেষণা কর্ম দেশে রয়েছে। তারপরও

মওলানার জীবনের যে বিষয়টি উপেক্ষিত এবং যথার্থভাবে উপস্থাপিত হয়নি তা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং দরদভরা অন্তিম কার্যকলাপ। ধর্মকে রাজনীতির বাহন হিসেবে অনুশীলনের উদাহরণ যেমন মধ্যযুগের ইউরোপে রয়েছে, ঠিক তেমনি আধুনিক যুগেও তাঁর উদাহরণ বিরল নয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে খ্রিস্ট ধর্মের স্বাধীন তার দর্শনকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন এক সময়ের খ্রিস্ট ধর্মবেত্তাগণ। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে এটি লিবারেশন থিওলজি বা স্বাধীনতা ধর্মতত্ত্ব বলে পরিচিতি পায়। কেউ কেউ একে রেভুলুশনারি থিওলজি বলে আখ্যায়িত করেন। এ বিষয়ে উপরে আলোচনায় সামান্য আলোকপাত রয়েছে। মূলত মওলানা ভাসানীর জীবনে এই থিওলজি বা দর্শনের প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজনে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন দৃষ্টিতে এই গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়। সংশ্লিষ্ট গবেষক কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করেন। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের জন্য গবেষক ফোরকান মিয়া পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। যারা বিষয়টি পরীক্ষণ, নিরীক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন তারা গবেষণাকর্মের উচ্চসিত প্রশংসা করেন। সরকার ও রাজনীতি বিভাগে অনুষ্ঠিত দু'টো সেমিনারে শিক্ষকমণ্ডলী বিষয়টির ওপর মূল্যবান আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। ফলে বিষয়টি পরিপূর্ণতা লাভ করে। উপস্থাপিত গবেষণা কর্মটি জ্ঞানালোকে প্রকাশের জন্য আমাদের উদ্যোগ ছিল। সবাই জানি, এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে বাধাবিঘ্ন রয়েছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট-বিআইআইটি তাদের অনুসৃত নীতিমালার আলোকে গ্রন্থটি প্রকাশে আগ্রহী হয়। সেখানে অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদন ও প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এর সুযোগ্য পরিচালক ড. এম. আবদুল আজিজ। আর ভাসানী-প্রেমিক কবি আবদুল হাই সিকদার পরিমার্জনে মূল্যবান ভূমিকা রাখেন। উপস্থাপিত গ্রন্থটির কৃতিত্ব একান্তভাবেই লেখক ও গবেষকের। ড. ফোরকান মিয়া ও বিআইআইটি আমাকে সম্পাদনার সম্মান দিয়ে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের পর যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ও তথ্যগত বিভ্রান্তি চোখে পড়ে তাহলে পাঠককুলের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করবো।

আবদুল লতিফ মাসুম
ফেব্রুয়ারি, ২০২২